Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.20-26
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্র মানস

অনির্বাণ সাহু
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract

Rabindranath Tagore accepted and evaluated Indian nationalism based on ideas of humanity. His motto and desire were the evolution of Nationalism of India in the proper, rational, and best possible way. It is to be noted that Rabindranath Tagore did not view Nationalism as a mere philosophical concept or political activity. In Tagore's life, politics was of lesser importance and sociology was of greater importance. And that sociology was deeply attached to ideas of humanity. Rabindranath was not only a man of letters, he was also a humanitarian philosopher, Nationalistic thinker, and an architect of Nation building. He edited a journal titled 'Bhandar' in 1905 during the movement against Bengal Division. It was discussed in that journal about the ways of eradicating poverty of Nation. Tagore had seen liberal melting of different races in the context of India as a Nation right from the Nationalistic period, in the same way he was pretty sure that the centre of Indian social life was its village. According to him, proper development of village becomes possible only when a coherent development of village education, health care facilities, and economy is achieved. Agriculture is the basis of the village economy. His contribution to the efforts of developing the villages of our country is unforgettable. His ideals of life were influenced by the concept of Nationalism. So, it was not difficult for aging Rabindranath to realize the extent to which love for Nation grows, the point at which the emotions of Nationalism should be checked at best, space where economic liberalism and the boundary of capitalistic mastery meet.

The greatest gift of Tagore during the Nationalistic period to the repository of Nationalism is his nationalistic song "Janaganamana Adhinayak". Tagore's concept of India and his thoughts of Nationalism are based on his concepts of universalism and feelings for the whole universe. The main tune of the National anthem is to execute the noble deed of a Great Nation by uniting the diverse and unique races, religions, languages, and ideals. Tagore's concept of Nationalism can easily solve the various regionalism and separatist activities in different parts of today's India.

***Keywords**: Nationalism, Universalism, Jingoism, Indian Philosophy, Cultural unity, Social humanism.*

জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যা জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। তবে এই জাতীয়তাবাদ অনেকটা আধুনিক আন্দোলনের প্রবাহ। ধারণাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি মানুষের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের রথযাত্রা শুরু হয়। আর ধীরে ধীরে পৃথিবী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। তবে কি মনে করতে পারি তার আগে জাতীয়তাবাদ ভাবধারা কারোর মধ্যে ছিল না? একটি মানুষ তার জাতি বা ভাষা সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য দেখায় না? অবশ্যই দেখিয়েছেন, অতীতের সমস্ত অধিবাসীরা তাদের আদি বাসভূমি, পিতা-মাতার ঐতিহ্য এবং একটি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল, নাহলে মানব সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি কখনো সম্ভব হতো না। আর মানুষ যে সভ্য জাতি সে খেতাব বহন করতো না সম্ভবত। সময়ের সাথে সাথে সমাজের ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে। মানুষ নিজেদের মধ্যে আরও সংগঠনের অভাব অনুভব করেছিল এবং এখানে জাতির ধারণা আসে। জাতীর ধারণাটি আরও বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে একত্রিত হওয়ার সম্মিলিত অনুভূতি ঘটে যা জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যযুক্ত মানুষের মধ্যে একটি নতুন ঐক্যের জন্ম দিয়েছে। একটি রাষ্ট্র যখন তার ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করে, জনগণের সাথে রাষ্ট্র বা জাতীর পরিচয় ও রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণের অবস্থা বোঝায়, তখন ঐ ভূখণ্ডের জনগণের কর্তব্য নিজের রাষ্ট্র ও জাতির হিতে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ, এটাই ব্যাপক অর্থে জাতীয়তাবাদ। যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের ঊর্দ্ধে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লাতিন আমেরিকায় নতুন দেশগুলিকে অনুপ্রবেশ করানোর পরে সারা পৃথিবীব্যাপি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের উত্থান ঘটে।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের জনগণকে ব্রিটিশপণ্য ব্যবহার বন্ধ রাখতে এবং স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি উৎসাহিত করতে শুরু করেছিল। ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ থেকে মূলত স্বদেশী আন্দোলন ভারতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রয়াস ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয় শিক্ষার প্রবণতা, জাতীয় আত্মসচেতনতা ও নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ঐ সময়ে স্বদেশপ্রীতির যে উন্মাদনার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তা অনেকটা রোমান্টিক নেশার মতো। দেশ চেতনা জেগে উঠেছিল সত্যি, কিন্তু দেশ বলতে সর্বসাধারণের কাছে ইতিহাস পুরাণের কল্পিত দেশকেই বোঝাত। প্রাচীন ভারতের গৌরব গাথা, হিন্দু জাতির শৌর্যবীর্যের কাহিনী, বেদ-উপনিষদের অতি উচ্চ আদর্শ এবং হিমালয় সমুদ্র ঘেরা সুবিস্তীর্ণ ভূখন্ড, নদী জপমালা দক্ষিণের দ্রাবিড়, উত্তরে আর্যসভ্যতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ তৎকালীন নিরক্ষর দরিদ্র রোগজীর্ণ গ্রামবাসীর কাছে নেহাৎই দূরের কল্পনা। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, রঙ্গলালের রাজপুত কাহিনীকাব্যে ; রমেশচন্দ্র দত্তের মারাঠা-রাজপুতের শৌর্যকাহিনীতে যে ভারতবর্ষের কল্পনা ছিল তা মুষ্ঠিমেয় ইংরেজী পড়া শহুরে বাঙালীকেই মত্ত করে তুলেছিল। কিন্তু শহরের বাইরে শত শত গ্রামের শিক্ষাহীন গ্রামবাসীকে তা স্পর্শ করেনি। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখনকার রাজনীতির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ। ইংরেজ সরকারের কাছে সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে আবেদন নিবেদন করেছে যা সবই শহুরে শিক্ষিত সভ্যের স্বার্থে। দেশের উন্মাদনা প্রকাশ পেত এই সমস্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে। ফলে শহরের বাইরে দেশের মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপনের সময় হয়নি। সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্রের সন্ধান, শিক্ষা-চিকিৎসার সমস্যার সাথে শিক্ষিত বাঙালীর কোন

ধারণা ছিল না। গ্রামের জমিদারের সহযোগিতাই ছিল সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে ইংরেজদের যোগের উপায়। ইংরেজ এদেশে আসার পর যে শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করে ছিল তা সাধারণ পল্লীবাসীর বোধের থেকে বহুগুণ দূরে। যার ফলস্বরূপ নবজাগরণ অসম্পূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সমাজের সর্বস্তরে। শিক্ষার ভাবনা চিন্তাকে এক আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য যে তিনটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তা হল — (ক) ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, (খ) ১০ অক্টোবর কুখ্যাত কার্লাইল ঘোষণানামা এবং (গ) রংপুর স্কুলের ছাত্রদের ওপর অপমানকর মনোভাব প্রদর্শন। এরই প্রতিবাদে ১৯০৬ সালে ১১ মার্চ ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসনের প্রেক্ষাগৃহে জাতীয়তাবাদীরা সমবেত হয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে সোচ্চার হন। এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এর প্রধান পথিকৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয়তাবাদ ভাবধারার ধারণাগত বিবর্তনের একটা পটভূমি উনিশ শতক থেকে তৈরী হয়েছিল। ১৮২৩ এর ডিসেম্বরে গভর্নর জেনারেল আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি থেকে এই বিবর্তনের সূত্রপাত ধরা যেতে পারে। রামমোহন যে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদি পড়বার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার প্রভাব বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের উপর পড়েছিল। ১৮০৪ খ্রিঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায়

শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে স্বদেশীকতার বীজ বুনে দেওয়া। তাঁর এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন রাজনারায়ন বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি ও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার মাধ্যম ও সর্বজনীনতা কোথায়, কীভাবে পাওয়া য়ায় তার হদিশ দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে আধুনিক চিন্তা কল্পনার বাহন করার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে তিনি এই 'তিন কোটি' বাঙালির দেশকেই মনে রেখেছিলেন। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশাও করা যায় না। সুতরাং বাংলায় যে কথা উচ্চারিত হইবে না তাহা তিন কোটি বাঙালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না সে কথায় সমাজের বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই[১]। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ বলতেই শহরাঞ্চলের বাইরে গ্রাম-বাংলাকেই মনে করতেন। আধুনিক শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে পৌঁছায়নি বলে তিনি শহরের উন্নতিকে দেশের উন্নতি বলে ভাবতে পারেনি। বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার সঙ্গে শিক্ষা / চেতনা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার সুফল সম্পর্কে তখন সকলেই পরিচিত। কিন্তু এই সুফল দেশের জনসমাজে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত দেশের মঙ্গল কখনোই সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার সাহায্য ছাড়া যে এটা হবার উপায় নেই রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ -তে লিখিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত একই কথা বলে গেছেন। এ সময়ের লেখাগুলির প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের দেওয়া বিবরণ যদি দেখি —

রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের কাজ বলিতে যে একটা রাজনৈতিক ধূয়া উঠিয়াছে তাহা শূন্যগর্ভ কথামাত্র ; কারণ দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য না করিলে দেশের উন্নতি হয় না। অথচ দেশবাসী যখন অত্যাচারে উৎপীড়িত, অন্নবস্ত্রাভাবে ক্ষীণ, তখন রাজনৈতিক নেতারা ঐসব দুঃখ আধিব্যাধি নিবারণের জন্য ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন। দেশবাসীর প্রতি যে দেশবাসীর কোন কর্তব্য আছে, তাহা উদ্বুদ্ধ করিবার কোনও প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাকেই তিনি দেশের পরিচয়হীন, সেবাবিমুখ আন্দোলন বলিয়া

নিন্দা করেন। 'হাতেকলমে' কাজের একটি উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করলেন। তিনি বলিলেন, " আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা না একটা শুনিতেই হয়।" এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে শক্তি তাহাকেই তিনি যথার্থ দেশের জন্য 'হাতে কলমে' কাজ বলিলেন — সভা বা agitation নহে[২]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি মূলত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। যার ফলে তাঁর চিন্তাধারা ছিল বিশ্বকেন্দ্রিক। চিন্তাধারাগুলি কেবল ভারতে বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'তিন কোটি' বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদের বিস্তারকে কবি মন্দ মহামারী হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন । জাতীয়তাবাদের সাধারণ বিশ্বাস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে ছিলেন এবং শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণের চিন্তাধারার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন ভারত যদি বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তা কেবল মানবতার মধ্যে দিয়ে সম্ভব। মানবতাবাদ যে কোনও সীমানা বা বাধা অতিক্রম করে এটি সর্বসাধারণ জায়গার সন্ধান দেয়। ভারতের মাটিতে গুরু নানক, কবির, চৈতন্যদেবের মতো মহান পুরুষেরা মানবতাবাদের শিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ণভিত্তিক শ্রেণী বিভাগের আগ্রাসী উত্থানের ফলে সময়ের সাথে সাথে বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। জাতিভেদের মতো সংকীর্ণ ধারণাগুলি বহু শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ গণহত্যা করেছে। এমনকি দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং অন্যান্য জাতিগত কোন্দল শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে লেলিহান শিখা বিস্তার করেছিল। সমাজে কেবল সেই ব্যক্তি বাঁচতে পারে যারা সভ্যতাকে আত্মস্থ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মধ্যে দিয়ে মানবতার আয়নার দিকে নজর দিয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজলব্ধ মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তিমনের স্বাধীনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা কেন্দ্রিক আন্দোলন বা ধারণাগুলি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রায় রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে চুড়ান্ত স্বাধীনতা বলে মনে করতে বাধ্য করেছে। ইউরোপের অন্ধ ধারণা ও এই ধরণের বিশ্বাসগুলি পরবর্তীকালে দখলের জন্য আমাদের লোভ বাড়িয়ে তুলবে। সুতরাং আমাদের এই সংকীর্ণতা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অভিব্যক্তিগুলিকে বিকাশের মধ্যে দিয়ে মনের স্বাধীনতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। এই মনের স্বাধীনতা মানব আত্মার এবং বৃহত্তর মানব জীবনের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পায়। আধ্যাত্মিক সংহতিকরণ, ভালোবাসা এবং অপরের প্রতি সহানুভূতির মধ্যে দিয়ে একটি জাতি পৃথিবীর বুকে যে কোনও যুগে স্থায়ী আসন পেতে পারে। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মানবতা ও মানব কল্যাণের সংহত আদর্শের মিশ্রণের ফল। তিনি মনে করেন বিশ্ব রাজনীতি আজ আধিপত্যবাদের রাজনীতি। জাতীয় বিভাজনের মধ্যে দিয়ে ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতা নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। ইউরোপীয় দেশগুলিতে পুঁজিবাদ নিজের শোষণমূলক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করে। এই পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব চরম জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ও সন্ত্রাসমূলক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ফ্যাসিবাদ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না ফ্যাসিবাদ বা উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি আমৃত্যু প্রতিবাদ করে গেছেন। আফ্রিকাবাসীদের প্রতি ফ্যাসিস্টদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ এবং লীগ অফ্ নেশনের উদাসীন ভূমিকা তাকে ব্যাথিত করে তুলেছিল। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের নিন্দা করে 'আফ্রিকা' কবিতাটি ছুঁড়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রসূত মানবসভ্যতার দিকে —

'আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল —
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো' —
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। [৩]

সমগ্র বিশ্ববাসী হয়তো অনুভব করে রবীন্দ্রনাথের বিদগ্ধ চিন্তাভাবনাকে, জাতির কল্যাণে তাঁর বাণী ছিল বেদমন্ত্রের মতো। সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীকে তিনি লড়াই করতে দেখেছেন। হিংস্র পশুর নখদন্তের চেয়ে ভয়াবহ মারণাস্ত্র দিয়ে ভাইয়ের বুক খুবলে খেয়েছে — যা একমাত্র মানুষের দ্বারা সম্ভব। তাই তিনি মানবতাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার করে বলেছেন, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে সুস্থ সহবস্থানের মধ্যে দিয়ে গোঁড়ামি মুক্ত সমাজ চেয়েছিলেন। সমকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদে মোহবিষ্ট হয়ে ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু একটি জাতীয় সামাজিক স্বাধীনতার দিকে তাদের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ নেই। স্বাধীনতা হল যখন কেউ তাদের সমস্ত অধিকার উপভোগ করতে এবং একই সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। যখন কোনও ব্যক্তির মতামতের লালনে এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমান অংশগ্রহণ থাকে, ব্যক্তি মর্যাদার সাথে বাঁচতে ও মরতে পারে। কিন্তু তা কখনোও ভারতবর্ষের মতো ধর্মীয় গোঁড়ামী যুক্ত দেশে সম্ভব হতো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে এই কথা জানান দিয়েছে ভারতের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় রেখাপাত করে — ' সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।'[৪]

এই ঐক্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্রীয় না যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে মত দিয়েছেন।

এসব লেখা দিয়েই এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুস্পার্শে জনজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন বলেই তাঁর চিন্তাকে গদ্যে প্রকাশ করে যাচ্ছেন। ১৮৯০-তে প্রকাশিত মানসী কাব্যের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রভৃতি। এই কাব্যগুলি কবির আত্মমগ্ন হৃদয়ের গুঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠেই জানা যায় প্রভাত সঙ্গীতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর অন্তরের অর্ধস্ফুট ভাবগুলি নিয়েই মগ্ন ছিলেন। প্রভাত সঙ্গীতের সময় থেকেই তাঁর হৃদয়ের জাগরণ। মানুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা এবং আনন্দ তারপর থেকেই স্পষ্ট। এই মানব লোককে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন বিশ্বমানবলোক। এই শব্দটি দিয়ে তিনি সমগ্র মানবিক অস্তিত্বের জগৎকেই বুঝিয়েছেন অর্থাৎ এই মানুষ কোনও সমাজ বা দেশের মানুষ নয়। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে

তুচ্ছতাই তুচ্ছ মনে হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বদেশ, সমাজে ভাবের নানা আলোড়ন এবং পরিবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে তার বিচারমূলক আলোচনা যেমন প্রকাশ করেছিলেন, কবিতাতেও তার কিছু প্রভাব পড়েছিল। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কবিতাগুলি তার দৃষ্টান্ত। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি বলেছেন —

তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি —
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবী বারি,
জ্ঞান কর্ম তে পুণ্য কাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না —
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে।[৫]

'আহ্বানগীত' কবিতাতে কবি বাঙালিকে জগতের যাত্রাপথে চলবার আহ্বান জানাচ্ছেন। সারা পৃথিবীতে মানব জাতির যে জয়যাত্রা চলছে, বাঙালি কি তাতে যোগ দেবে না ?

' আছে ইতিহাস, আছে কুলমান
আছে মহত্বের খনি —
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন্ তার প্রতিধ্বনি।' [৬]

এই কবিতাগুলিতে কবি তাঁর স্বদেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন। এই ভঙ্গি এবং সুর সেকালের জাতীয়তাবাদের তন্ত্রে বাঁধা। এই ভঙ্গিমাতে কবি হেমচন্দ্র 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ' প্রভৃতি কবিতা লিখেছিলেন। কলকাতার সমাজে ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে যে জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, আমাদের বাংলা সাহিত্যে তার প্রবল ছাপ পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কল্পনাপ্রবণ ভাবমগ্ন কবি হলেও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু এসবই নাগরিক কবির স্বদেশ ভাবনা। তখনও এই চেতনা প্রাচীন গৌরবস্মৃতি নিয়েই নবজীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। এই ভাবনাটিও ছিল শিক্ষিত আলোকদীপ্ত সমাজেরই ভাবনা। তাঁর জাতীয়তাবাদ ভাবনা ছিল উপস্থিত কর্তব্যকে আশ্রয় করে ; সেই জন্যই কখনও তাতে শাসক-শাসিতের বিরোধের ভাব এসেছে, কখনও গঠনমূলক আদর্শের কথা এসেছে, কখনও পল্লীজীবনের নানা দুর্গতিমোচনের অধীরতার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণশীল মনোভাব, এক উন্নত মাত্রা দান করেছে সমাজকে।

১৯১০ সালে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসে গোরার সেই বিখ্যাত উক্তি —

'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাত আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।'

আনন্দময়ীকে বলল —

'মা তুমিই আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই — শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' [৭]

আবার তাঁর 'জনগণমন' গানটির মধ্যে আমরা কি নিবিড় জাতীয়তাবোধকে ধরতে পারি, বুঝতে পারি। তাতে ভারতবর্ষের নানা ধর্ম, নানা প্রদেশ, নানা ভাষার অধিষ্টাতা ঐক্যবিধায়ক ভারতবিধাতারই বন্দনা। বর্তমান প্রচলিত অর্থে সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়া রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই ছিল না। ভারতবর্ষকে তিনি দেখেছেন নিজ নিজ ধর্মের অভিমান বর্জিত এক মানবজাতির তীর্থভূমিরূপে। এই বোধসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের

কাজে সমাজ নতুন করে জাতীয়তাবাদের ভাবনা দেখতে পারে, শিখতে পারে, মর্মে অনুভব করতে পারে। আমাদের জীবনকর্মকে সেই প্রেরণাই চালিত করুক।

তথ্যসূত্র:

(১) 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা' - বঙ্গদর্শন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১২৭৯ চৈত্র সংখ্যা।
(২) 'হাতে কলমে' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ)১৯৭০, পৃঃ ১৮৭।
(৩) 'আফ্রিকা' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পত্রপুট' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৬ সংখ্যক কবিতা।
(৪) 'সভ্যতার সংকট' (কালান্তর) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৮৭, প্রকাশ - ১৩৪৪ বৈশাখ।
(৫) 'বঙ্গভূমির প্রতি' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৮৬ খ্রিঃ)
(৬) 'আহ্বানগীত' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ(ইং ১৮৮৬ খ্রিঃ)
(৭) 'গোরা' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পরিশিষ্ট অংশ, পৃঃ ৬৪৯, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, মাঘ ১৪১৮, জানুয়ারী - ২০১২

সহায়ক গ্রন্থ:

(১) ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ - প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং।
(২) রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা - প্রমথনাথ বিশী, পঞ্চম মূদ্রণ, রথযাত্রা ১৩৯১, ওরিয়েন্ট বুক কোং।
(৩) রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা - অচিন্ত্য বিশ্বাস, কলকাতা, বৃন্দবাক্ ১৯৯৯।
(৪) রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র - অমরেশ দাস, কলকাতা, মণ্ডল বুক, ১৯৯৮।
(৫) রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা - আবু জাফর, চট্টগ্রাম, বইঘর ১৯৮৫।
(৬) রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা - চিন্মোহন সেহানবীশ, কলকাতা, নাভানা ১৯৮৭।
(৭) রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লব সমাজ - চিন্মোহন সেহানবীশ, বিশ্বভারতী ১৯৯৮।
(৮) রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ - জীবেন্দু রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৯১।
(৯) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্র সাহিত্য - নেপাল মজুমদার, কলকাতা, দে'জ, ১৯৮৩।
(১০) রবীন্দ্র চেতনায় মানব ধর্ম - তুষারকণা রায়, সমীর পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮৫।
(১১) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ - মনোরঞ্জন জানা, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭৯।
(১২) রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক - মোফাজুল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
(১৩) রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার - সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, সৃজন পাবলিকেশন, ১৯৮৬।
(১৪) রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্মচেতনা (৩য় সংস্করণ) - স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কলকাতা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৮৪।
(১৫) Tagore's Approach to Social Problems, Kolkata - Sashadhar Sinha, Modern Books, 1947.
(১৬) The Philosophy of Rabindranath Tagore - Benoy Gopal Roy, Bombay, Hind Kitab Ltd. 1949.